একাদশ অধ্যায় ২৬৩—২৫১

সাহবাগে স্বতঃস্ফূর্ত নমাজ পাঠ—সাধকের শক্তি প্রকাশ সম্বন্ধে সতর্কবাণী—ভোলানাথের মাতৃপূজা—ভোলানাথের তারাপীঠ গমন —যজ্ঞোপবীত গ্রহণ—কালীমূর্তির স্থানান্তর—আগ্রহজনিত কর্মের সুফল—আশ্রম প্রতিষ্ঠা ও ঢাকা ত্যাগ—হরিদ্বার, অযোদ্ধা, দেরাদুন ও কাশীতে মা—নবদ্বীপের মৌনীবাবা

দ্বাদশ অধ্যায় ২৫২—২৭১

ভোলানাথের অসুখ—রোগ সম্বন্ধে মায়ের খেয়াল—সাধনায় সাধকের শরীর—প্রতিদিন মাঠে বেড়ানো—জ্যোতিষকে যজ্ঞোপবীত দান—সিদ্ধেশ্বরীতে পাঁঠাবলি উপলক্ষ্যে—ধর্মপুত্ররূপে জ্যোতিষ— শকুনকে প্রসাদ দান—আশ্রমে পঞ্চবটী—এক যুবক সন্ন্যাসী— কালীমূর্তির অঙ্গে আঘাতে মায়ের শরীরে প্রতিক্রিয়া—ঢাকা আশ্রমের নীচে সমাধি—কীর্তনে যোগেশের সহিত মায়ের লীলা— যোগেশের ভিক্ষা বৃত্তি—বিনা জলপানে ঢাকা হইতে যাত্রা

প্রথম অধ্যায়

পূর্ব বিবরণ

একদিন কথায় কথায় মার পূর্ব বিবরণের কথা উঠিলে আমার বিশেষ আগ্রহ সহকারে বার বার জিজ্ঞাসায় মা বলিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে এই শরীরের মাতুলালয়ে প্রতি বৎসর দোল ও দুর্গোৎসবাদি হইত। শরীরের মার নাকি সর্বদা ভগবানের নিকট এবং পূজার সময় শ্রীদুর্গার নিকট স্বভাবতঃ সন্তান প্রার্থনা জাগিত। তাহার পরই একটি কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়া কয়েক মাস পরেই সেই সন্তানটি গত হইলে মার সুসন্তান কামনার প্রার্থনা আরও গভীরের দিকে।

এই শরীরের পিতা অতিশয় কীর্তনপ্রিয় ছিলেন। দেশে দেশে ঘুরিয়া কীর্তনে দিন কাটাইতেন। কেহ কেহ বলিত, না জানি কাহার ঘরের এমন সোনার চাঁদ ছেলে মা বাপ পরিজনদের কাঁদাইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। তিনি প্রথম জীবনে তাঁহার মাতুলালয় খেওড়া গ্রামেই অতিবাহিত করেন। তাঁহার মা তাহাকে বহুদিন যাবৎ খুঁজিয়া পান না। একমাত্র পুত্র সন্তান বলিয়া সর্বদাই কান্নাকাটি করিতেন — ছেলেটি উদাসী হইয়া কোথায় চলিয়া গেল। এমন কি শুনিয়াছি কিছু সময়ের জন্য গেরুয়া বস্ত্রও নাকি ব্যবহার করিয়াছিলেন। একদিন খবর আসিল যে তিনি কোন গ্রামে কীর্তনাদিতে দিনাতিপাত করিতেছেন। তখন অনেক চেষ্টায় তাঁহাকে সেখান হইতে বাড়ী ফিরাইয়া আনা হয়। তাঁহার ভগবৎ প্রীতি এবং নাম-গানে অনুরাগ স্বভাবতঃই ছিল, কণ্ঠও ছিল মধুর।

এই শরীরের ঠাকুরমা অতিশয় ধর্মশীলা এবং সরল প্রকৃতির ছিলেন। এই শরীরের তোমাদের দৃষ্টিতে বিবাহ দিবার পূর্বেই তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহারও মন্দিরাদিতে গেলে মনে মনে ঠাকুর দেবতার নিকট পুত্রের সুসন্তান কামনা থাকিত। ইহার ভিতর তিনি একদিন প্রসিদ্ধ কসবা কালী বাড়ী যান। সেখানেও মনে মনে পৌত্র মুখদর্শন প্রার্থনা করিতে বসিয়া নাকি হঠাৎ তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল — পৌত্রী হইয়া যদি বাঁচিয়া থাকে তবে তাহার বিবাহে মা কালীকে ভালভাবে পূজা দিব। নমস্কার করিয়া উঠিতেই তাঁহার

খেয়াল হইল যে তিনি পুত্র প্রার্থনা করিতে আসিয়া কন্যা চাহিয়াছেন। তখন তাঁহার মনে হইল এত আকাঙ্খা করিয়া এতদূর হাঁটিয়া হাঁটিয়া আসিলাম নাতির কথা বলিব বলিয়া, মা আমাকে ভুলাইয়া দিলেন।* আচ্ছা! তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। শরীরের মায়েরও ত যে কোন দেবদেবীর মন্দিরাদিতে গেলেই স্বাভাবিক ভাবেই এই প্রার্থনা জাগিত। কিছু সময়ের মধ্যেই এই শরীরটা।

আবার একদিন মার সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে কথায় কথায় মাকে প্রশ্ন করিলাম — আমাদের দেখা সদ্যোজাত শিশু অবস্থার বিবরণ কি করিয়া বলা সম্ভব? উত্তরে মা বলিলেন — সব সময় সব কথা বলিবার খেয়াল ত হয় না। যতটুকু আসে।

এই শরীর বালিকা বয়স হইতে বউ প্রভৃতি সাজিয়া যাহা যাহা দেখার দিক, তাহা যেরূপ তোমাদের বলিয়া থাকে, তোমাদের এই শরীরটা দেখার অব্যবহিত পরে অবস্থাদি এই শরীরের বেলাও প্রায় তদ্রূপই মনে কর না। এই শরীরের সবই ত তোমাদের প্রয়োজনানুযায়ী আপনা হইতেই হইয়া যাইতেছে। এই সব বলাবলিও তোমাদের আগ্রহে সেইরূপ আসিতেছে। কিন্তু মনে রাখিস্ ছেলেদের যজ্ঞোপবীতের সময় জীবের যে পুনর্জন্ম সংস্কার, দ্বিজ বলে না? ধর না যেমন মন্ত্র, সূত্র ও নূতন বস্ত্রাদি দ্বারা তাহাদের বহিরাবরণ পরিবর্তিত করা হয়। আর এইখানে এক নব কলেবর সংঘটিত দেখিতেছ ত। ইহা যে তোমাদের দৃষ্টিতে। জীবের পক্ষে গুরুকৃপা বা বিনা সাধনায় এই তত্ব হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ। শক্তি কোথায়? উপমা কিন্তু সর্বাঙ্গীন হয় না, যেটুকু ধরিবার ধরিয়া নেওয়া। মাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম — আমরা কিভাবে ধরিব? উত্তরে মা হাসিয়া বলিলেন — আরে! ধরা না দিলে ধরে কে?

কনখলে গঙ্গার তটে বাঁধান গাছতলায় বসিয়া জন্মকথা ইত্যাদি আলোচনায় ও বার বার প্রশ্নে ও বিশেষভাবে জিজ্ঞাসায় মা কেমন একভাবে বলিতে লাগিলেন — কথা ত কতই। এলোমেলো কথা কিছু শুনবি ত শোন্।

* এই বৃদ্ধা আসা যাওয়ার ১২ মাইল পথ হাঁটিয়া পৌত্র কামনায় মা কালীর কাছে প্রার্থনা করিতে আসিয়াছিলেন।

বাল্যলীলা

বৈশাখ মাস বৃহস্পতিবার রাত্রি অবসানের দিক দিয়া এই শরীর খেওড়ায় এক খড়ের ঘরে তোদের দৃষ্টিতে ত। প্রায় পূর্ব ও উত্তর কোনের দিকে মাথা। শরীর কিন্তু তোদের দেখায় মাটি স্পর্শ মাত্রই চিৎভাবে একটু বামে হেলিয়া যায়। তখনই এই শরীরের ঠাকুরমার আপন খুড়িমা ধরিয়া তোলেন। কেবল তিনিই একমাত্র ঐ সময়েতে ঐ ঘরে ছিলেন। আর ত কেউ ছিল না। তাহার প্রকাশ তিনিই জানেন। খড়ের চালের ফাঁক দিয়া নিমগাছ ও আমগাছের ডাল পাতা দেখিতেছিলাম। ঠাকুরমার এই খুড়িমার বয়স তখন ৬০ বছরের কাছাকাছি। তিনি বড় নিষ্ঠাবতী ও শুদ্ধাভাবাপন্না স্ত্রীলোক ছিলেন। এই শরীরের বিবাহের পর তিনি মারা যান।

পরদিন প্রাতে ঐ গ্রামেরই একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দেখিতে আসেন। ঠাকুরমা ঘরের দরজায় যাইয়া হাঁটু গুঁজিয়া বসিয়া এই শরীরকে কোলে করিয়া তাঁহাকে দেখান। সেই সময় ঐ ব্রাহ্মণ নাম রাখিলেন দাক্ষায়নী। তখন এই শরীরের মাথা ঠাকুরমার হাঁটুর উপর পূর্ব দিকে ছিল। উর্দ্ধ দিকে চাহিতে চোখে পড়িতেছিল কয়েকটি গাছের ডালপাতা ও আকাশ।

এই শরীরটা সেই সময়েতে যে ঘরে ছিল সেইখানে একদিন দেখা যায় যে ঘরের বাতিটি নিভিবার মত হইল। ঠাকুরমা হরিবোল, হরিবোল করিতে লাগিলেন। মা তাড়াতাড়ি এই শরীরকে বিছানা হইতে বুকের ভিতর লইয়া বাম হাতে চাপিয়া ধরিলেন। পূর্বে এক মেয়ে মারা যাওয়াতে গ্রাম্যভাবে ভূতপ্রেতের ভয় উপলক্ষ্য করিয়া সব সময় এই শরীরের নিকট কেহ না কেহ থাকিত। সর্বদা ভগবানের নাম করিত ও প্রথম দিবস হইতেই এই শরীরকে তুলসীতলায় নিয়া দুই বেলা গড়াগড়ি দেওয়াইত। শরীর একটু বড় হইলে নিজেই যাইয়া গড়াগড়ি দিয়া আসিত।

মা ঘরের বাহিরে যাইবার সময় বাম পায়ে এই শরীরের চারিদিক ঘুরাইয়া ঠাকুরের নাম করিয়া রাখিয়া যাইতেন। রংটা নাকি ধব্‌ধবে ছিল, তাই মা নাম দিয়াছিলেন নির্মলা। আনন্দে ঠাকুরমা নাম দিয়াছিলেন তীর্থবাসিনী। এইরূপে আরও কয়েকটি নাম হইয়াছিল।

এই শরীরের তিন মাস বয়সে মা তাঁহার পিত্রালয় সুলতানপুর যান। কয়েকদিন পর সেইখান হইতে মা তাঁহার মামার বাড়ী যান। ভাবিলেন অল্প কয়েকদিন তথায় থাকিবেন, নিজের বাড়ীতে খবর না দিলেও চলিবে। সেই বাড়ী যাইতে যখন নৌকায় উঠা হয় তখন হইতেই এই শরীরের জ্বর ও সর্দি দেখা দিল, চোখও মেলে না, খাওয়াও নাই। না বলিয়া মা মামাবাড়ী গিয়াছেন কি জানি যদি কিছু খারাপ হয় এই কারণে সকলে বিশেষ চিন্তিত হইল। ঔষধ পত্র ত যাহা করিবার করে আর দুই বেলা এই শরীরকে তুলসীতলায় নিয়া গড়াইয়া আনে। তাড়াতাড়ি যেইদিন মা সেইখান হইতে সুলতানপুর রওয়ানা হইলেন সেইদিনই নৌকায় আসিয়া এই শরীরের চোখ খুলিয়া গেল। জ্বর ও সর্দির বেগও কমিয়া গেল। সকলে এই পরিবর্তন দেখিয়া অবাক এবং বলাবলি করিতে লাগিল যে চুপি চুপি বেড়াইতে আসার দরুণ ভগবান এই শিক্ষা দিলেন। গ্রামের নিয়ম এই যে স্ত্রীলোকেরা কোথাও যাওয়া আসা করিতে পুরুষের অনুমতি লইতে হইত।

দশমাস বয়সের পূর্ব পর্যন্ত যখন এই শরীর বসে ও হামাগুড়ি দেয় তখন নিকটস্থ মুসলমানের মেয়েরা বাড়ীতে বেড়াইতে আসিলে এ শরীরকে কোলে নিয়া আনন্দ করিত। দেশের প্রথায় মুখে ভাত না দেওয়া পর্যন্ত অপর জাতিতে ছুঁইবার কোন বাধা নাই। গ্রামে স্পর্শজনিত শুদ্ধি অশুদ্ধিভাব সেই সময় খুব প্রবল ছিল। তাই এই শরীরকে মাটিতে ছাড়িয়া দিয়া দেওয়া নেওয়া করিত। একবার এই শরীরকে নিয়া ঠাকুরমা পাড়ায় এক মুসলমান বাড়ীতে বেড়াইতে যান। সেখানে একাব্বর নামে একটি মেয়ে ছিল। সে শরীরকে কোলে নিতে চাহিলে ঠাকুরমা মাটিতে ছাড়িয়া দেন। একাব্বর এক একবার হাত বাড়ায়, এ শরীরটা তাহার কাছে দৌড়াইয়া যায় আর সে পিছনে পিছনে সরিয়া যায়। এইরূপে সে অনেকক্ষণ খেলিতেছে ও হাসিতেছে পরে এ শরীরের এমন কান্না আসিল যে, সে কোলে নিয়া এবং কত আহ্লাদ করিয়াও আর শান্ত করিতে পারে না। অবশেষে সে হয়রাণ হইয়া ভয় পাইয়া ঠাকুরমার নিকট নিয়া মাটিতে ছাড়িয়া দিল। তিনি এ শরীরকে কোলে নিয়া অনেক চেষ্টায় আদরে কান্না থামাইলেন। সে মেয়েটি তাহার পর হইতে আর ঐরূপ তামাসা করিত না। এ শরীরের মার নিকট গিয়া সে বলিয়াছিল কান্না

দেখিয়া তাহার খুব ভয় হইয়াছিল। সেই কথা মনে করিতেও তাহার শরীরে কাঁটা দেয়। সে মেয়েটি এ শরীরকে বড় ভালবাসিত। তাহার বিবাহের পরও পিত্রালয়ে আসিলে সে এই শরীরকে দেখিতে আসিত এবং উক্ত ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলিত — আমি তাহা জীবনে ভুলিতে পারিব না।

ঠাকুরমার খুড়িমাকে (যিনি এ শরীর তোদের দৃষ্টিতে দেখার সময়ে ঘরে ছিলেন), এ শরীর বড়মা বলিয়া ডাকিত। তাহার কয়েকটি গরু ছিল, অনেক দুধ দিত। রোজ মাঠা (ঘোল) করা হইত। যখন ছোট, ন্যাংটা অবস্থায় এ শরীর একটি বাসন পেটের উপর চাপিয়া ধরিয়া খুব ভোরে তাহাদের বাড়ী যাইত। মাঠা হইলে তিনি প্রথম এ শরীরকে একটু মাঠা ও মাখন দিতেন। সে সময় এ শরীর খুব সুস্থ ও সবল ছিল ত। কেহ কেহ তামাসা করিয়া বলিত "চালকুমড়া"।

একদিন বাসনটি পেটের উপর রাখিয়া এ শরীর মাঠার জন্য যায়। বড়মা দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন — এই মাত্র মাঠা করিতে আরম্ভ করিলাম আর তিনি নিবার জন্য পূর্ব হইতেই হাজির। নিত্যই মাঠা খায়, মাঠা পাবি না, যা। বিরক্তির ভঙ্গীতে এই কথা বলিলেন। তিনি তখন দেখেন কি তাহার মাঠা মন্থনের পাত্রটি ছ্যাঁদা হইয়া সব দই পড়িয়া যাইতেছে। তখন তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন — এ কি হইল আবার! সেদিন আর মাঠা হইল না। পাত্রে যাহা ছিল তাহা হইতে তাড়াতাড়ি এ শরীরটাকে ডাকিয়া কিছু দিলেন। তাহার পর হইতেই এ শরীরের যাইতে দেরী হইলেও বড়মা ডাকিয়া নিয়া মাঠা দিতেন।

শারদীয়া পূজার সময় এই শরীরের ছোটমামা (স্বর্গীয় সারদা চরণ বিদ্যাসাগর) আসিয়া সকলকে মামাবাড়ী লইয়া যাইতেন। তাহার অন্যান্য বোনেরাও সেই সময় সেখানে আসিত। এই উপলক্ষ্যে অনেক ছোট মেয়ে তথায় একত্র হইত। কিন্তু দেখা যাইত যে এই শরীরকে বুকে পিঠে করিয়া সকলেরই বেশী আনন্দ হইত। ছোট মামা এ শরীরের কথাবার্তা, হাবভাব, চলাফেরা বিশেষ রূপে লক্ষ্য করিতেন।

প্রায় আড়াই বছর বয়সে এই শরীর একবার মামাবাড়ী যায়। পাশের বাড়ীতে রাত্রিতে কীর্তন হয়। এ শরীরকে কোলে করিয়া

মা সেখানে যান এবং এক জায়গায় বসাইয়া বলেন — ঐ কীর্তন দ্যাখ্, শোন্। মা বাবা যখন যে কথাটি বলিতেন ঠিক তাহাই করিতাম। সেদিন মার কথামত কীর্তনের দিকে চাহিয়া আছি, শুনিতেছি বটে কিন্তু মাঝে মাঝে শরীর ঢলিয়া পড়িতেছে। মা কীর্তন শুনিতে বলিতেছেন, কিন্তু বাস্তবিক শুনিলে যেমন ভাব হয় তেমনই হইয়া যাইতেছিল। মা ভাবিলেন বুঝি ঝিমাইতেছে। তাই বার বার ধাক্কাইয়া বসাইয়া দেন। আর বলেন — সকল ছেলে মেয়েরা বসিয়া আছে আর ওর কেবল ঘুম। এত চিৎকার, এত খোল করতালের আওয়াজ, এটার ঘুমই ভাঙ্গে না দেখি। এদিকে এ শরীর ত অবশ। কীর্তনের সঙ্গে যেন মিশিয়া রহিয়াছে। কীর্তন শেষ হইয়া গেল, ঘরে আনিয়া মা শোয়াইয়া রাখিলেন। পরদিন সকালে যখন ডাকিয়া উঠাইলেন তখন এই শরীরের ঢুলু ঢুলু ভাব। মা ভাবিলেন রাত্রি জাগরণে বা কিসে এইরূপ হইয়াছে।

এ শরীরের বাবা প্রত্যহ শেষ রাত্রিতে হরিনাম করিতেন। পাঁচ বৎসর বয়সে একদিন রাত্রিতে এই শরীর বাবার নিকট শুইয়া আছে। গান শুনিয়া বাবাকে জিজ্ঞাসা করিল — আচ্ছা বাবা, হরি কি? তিনি বলিলেন — হরি ভগবানের নাম। এ শরীর বলিল — আচ্ছা! তাঁহার নাম করিলে কি হয়? বাবা বলিলেন, তাঁহাকে ডাকিলে তিনি আসেন। এ শরীর বলিল — তিনি আসিয়া কি করেন? বাবা বলিলেন — তোমাকে যদি আমার কোন দরকার হয় তখন তোমাকে ডাকিলে তুমি যেইরূপ আস সেইরূপ তিনিও আসেন। যাহার যাহা ইচ্ছা তাঁহাকে সরল প্রাণে বলিলে তিনি তাহা পূরণ করেন আমরা যেমন তোমাকে ডাকিয়া বলি যে আমার জন্য এইটি নিয়া আস, তুমি তাহা আনিয়া দাও ত, ঠিক তেমনি ভাবে যে যাহা তাঁহার নিকট চায় তিনি তাহা দেন। এই রকম আরও কত কি করেন কি বলিব। এ শরীর বলিল—তাঁহাকে হরি বলিয়া ডাকিলেই তিনি আসিবেন? বাবা বলিলেন — হ্যাঁ। এ শরীর বলিল — তিনি কত বড়? বাবা বলিলেন — অনেক বড়। এ শরীর বলিল — ঐ যে মাঠটি আছে তাহাতে ধরিবে না? বাবা বলিলেন — না। তাঁহাকে হরি হরি করিয়া ডাকিলে তিনি আসেন, তখন দেখিবে তিনি কত বড়।

এ শরীরের কখনও কখনও সরল ও উন্মনা ভাব দেখিয়া সকলেই বোকা ও টেলা বলিয়া ধারণা করিত। কেহ কেহ বে-দিশা বলিত।

আরও বলিত এইটি তাহার ঠাকুরমার স্বভাবও একটু পাইয়াছে। যদি এইসব সারিয়া না যায়, তবে বিবাহ দিলে যে কি উপায় হইবে ভগবান জানেন!

এ শরীরের ছোট বয়সে ঘরের ছাউনি এক রাত্রিতে তুফানে উড়িয়া যায়, সকলে ভয় পায়। আর এ শরীর 'ঘর পড়িয়া গেল, ঘর পড়িয়া গেল' বলিয়া উল্লাসে হাত তালি দিতে থাকে। তাহার পরদিন সন্ধ্যায় অন্ধকার হইলে চালের সেই ফাঁক দেখাইয়া এ শরীর মাকে বলে — মা দেখ! দেখ! ঘরের ভিতর বসিয়া কি সুন্দর তারাগুলি দেখা যাইতেছে। বাহিরে যাওয়ার আর দরকার হয় না। মা বলেন — হ্যাঁ, তুই যেমন তোর কথাও তেমনি। পাগলের গো-বধে আনন্দ। এ শরীর শীত বা গ্রীষ্মে বড় কাহিল হইত না। বৃষ্টির জলেও ছুটাছুটি করিয়া মহা আনন্দে খেলিত। মা বলিতেন এটাকে দেখি কিছুতেই কাবু করিতে পারে না। পিতামাতা উভয়েই এ শরীরের বিচিত্র ভাবভঙ্গী দেখিয়া নানা দুঃখকষ্টের মধ্যেও আনন্দে হাসিতেন।

এ শরীর ছয় বছর বয়সে পূজায় মামাবাড়ী যায়। একদিন পূজা দেখিতে দেখিতে এ শরীরের ঝিম্‌ঝিম্ ভাব হইল ও মুখ দিয়া অস্পষ্টভাবে কি কি বাহির হইতে লাগিল। ছোটমামা অনেকক্ষণ পর্যন্ত এ অবস্থা লক্ষ্য করিতেছিলেন। পরে বলিয়া উঠিলেন — কি বলিতেছিলি, আমাকে বল ত? এ শরীর চুপ হইয়া গেল। তিনি এ শরীরকে এক অসাধারণভাবে দেখিতেন। পূজার সময় কুমারী-জ্ঞানে সর্বাগ্রে ইহাকেই কুমারী করিতেন ও খাওয়াইতেন। এইরূপে আরও কেহ কেহ এ শরীর কাছে থাকিলে ইহাকে কুমারী ভোজন করাইয়া বড় তৃপ্তি লাভ করিতেন।

এ শরীর সাত বছর বয়সে বড়মার সঙ্গে চাল্‌নার শিববাড়ী যায়। বড়মা কিছু সময় এ শরীরকে একটা বটগাছের তলায় বসাইয়া রাখিয়া ছিলেন। তখন এ শরীরের দৃষ্টিতে পড়িল একখানি ঠাকুরঘর। কিন্তু তাহাতে কোন মূর্তি নাই। নিকটবর্তী একটি পুকুর। পুকুরের দিকে চোখ ফিরাইতেই এই শরীর দেখিতে পাইল যে পাথরের একটি শিব একবার পুকুরের জলে ডুবিতেছে ও একবার ভাসিয়া উঠিয়া লাফাইয়া পড়িতেছে। এই প্রসঙ্গে আরও কত কথা আছে, যখন যতটুকু কথা আসে। ইহার কতক্ষণ পর ঠাকুর ঘরে আসিয়া এ শরীর ঐ শিবমূর্তিটিকে সেখানে দেখিতে পাইল। বাড়ী ফিরিয়া কথা

প্রসঙ্গে যাহা যাহা এ শরীর দেখিয়াছে জানাইলে, অন্যান্য সকলে বলিল যে তাহারা ত মন্দিরেই শিব দেখিয়াছে। পরে শোনা গেল, এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে ঐ শিব সকল সময় মন্দিরে থাকেন না। পুকুরে ও জঙ্গলে ঘুরিয়া গড়াইয়া বেড়ান।

আবার জিজ্ঞাসায় মা বলিতে লাগিলেন — বৈশাখ মাসে গ্রামে সকলে পাকা আম দিয়া বৈশাখী পূজা করে। এ শরীর মাকে একদিন বলিল — মা আমাদের পাকা আম কই? মা বলিলেন — আমাদের কি বাগান আছে? আমাদের আম লাগিবে না। বাহিরে অন্যদের বাগানে কতকগুলি আম গাছ ছিল। কিন্তু মায়ের আদেশ ছিল যে সেইসব গাছ হইতে কখনও কোন ফল পাড়িয়া আনিও না। তলায় পড়িয়া থাকিলে আনিতে পার। এ শরীর আগের দিন ঘাটে গিয়া দেখিতে পাইয়াছিল যে একটি গাছের অনেক উপরে একটি আম লাল হইয়া আছে। সেদিন খেয়াল হইল ঐ আমটি যদি ঝরিয়া পড়িত তবে পূজায় দেওয়া যাইত। ইহা খেয়াল করিতে করিতে এ শরীর সে জায়গায় যাইয়া দেখে আমটি পড়িয়া রহিয়াছে। আনিয়া মাকে দিলে মা বলিলেন,—পাড়িয়া আনিস নাই ত? এ শরীর কি করিয়া উহা পাইয়াছে বলাতে মা পূজায় দিলেন। এ শরীর সত্য কথাই বলে মার জানা ছিল। ব্রতে, পূজায়, কীর্তনে, ব্রতকথায় বা পুঁথিপাঠ হইলে এ শরীরের খুব আনন্দের প্রকাশ দেখা যাইত।

আর একদিন মা বলিলেন — তোদের যেমন ভাগ্য, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস, বাড়ীতে একটি আমও নাই যে খাইবি। কিছুক্ষণ পরে এ শরীর ঠাকুরমার সঙ্গে জঙ্গলে শাক খুঁজিতে গিয়াছে, একটি বেশ বড় আম সেখানে পাওয়া গেল। ঐ জায়গায় কোন আম গাছও ছিল না। কেহ আনিয়া যেন আমটি রাখিয়া গিয়াছে। এত ভাল আম সাধারণতঃ পাওয়া যায় না। আম দেখিয়া মা অবাক। এইরকম সুন্দর সুমিষ্টগন্ধ, দেখিতে সুন্দর, যেন আমটিই দিব্য। এই রকম আম যেন আর কখনও কেহ দেখে নাই গড়নও যেন আলাদা। আমটি হাতে নিয়া মার মুখ আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

এ শরীর একদিন মার কাছে শুইয়া আছে, হঠাৎ মাকে জিজ্ঞাসা করিল — স্বর্গ স্বর্গ যে বলে, মানুষ ইচ্ছা করিলেই কি স্বর্গে যাইতে পারে? মা বলিলেন — হ্যাঁ, যাওয়ার একান্ত আগ্রহ হইলে মানুষ সেখানে যায়। এ শরীর বলিল, কোন দিক দিয়া তাহার রাস্তাটা,

বল না মা। মা বলিলেন — মানুষের যখন খুব ইচ্ছা জাগে তখনই সে রাস্তা দেখিতে পায়। এ শরীর বলিল, তবে এ শরীর ইচ্ছা করিলে যাইতে পারিবে? মা বলিলেন — হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। এই সব ধর্ম কথা, নানা আলোচনা মার সঙ্গে।

একদিন বহুদূরে এক বাড়ীতে কীর্তন ও খোলের ধ্বনি শুনিয়া মাকে এই শরীর জিজ্ঞাসা করিল — এই সব করিলে কি হয়? মা বলিলেন — ভগবান সন্তুষ্ট হন। মনে মনে নাম করিলেও তিনি শুনিতে পান। যাহা কেহ দেখিতে পায় না, তিনি তাহাও দেখেন। এইরূপ অনেক ভাল ভাল কথা বলিলেন।

পূজা পার্বণ বা বিবাহ ইত্যাদির বাজনা কিংবা কোন বৃহৎ ধ্বনি শুনিলে — এ শরীর নিজেই ত সেই ধ্বনি, আবার শোনাও — ঐ ভাবে শরীর স্থির হইয়া স্বাভাবিক চলাটা কিছুক্ষণ বন্ধ থাকিত। কোন সময় কাহারও কান্না বা হাসি দেখিলে এ শরীর তাহাদের সাথে সমভাবে যোগদান করিত। আবার ইহাও হইত যে হাসি কান্না বা অন্য কোনরূপ কোলাহলের আতিশয্যের ভিতরও এ শরীর একেবারে উদাসীন নির্লিপ্ত।

এ শরীরের তিন চার বছর বয়সে মামাবাড়ীতে মার খুব অসুখ হয়। এ শরীর খায় দায় ঘোরে ফিরে কিন্তু মার ত্রিসীমানায়ও যায় না। সকলে বলে এ কেমন ধারা মেয়ে, মাকে একবার উঁকি দিয়াও দেখে না! ইহার মায়া মমতা কি একেবারেই নাই!

এ শরীর একবার শারদীয়া পূজার সময় অধিবাসের দিন দুপুর বেলা মার সঙ্গে ঘরে খাইতে বসিয়া দেখিতে পাইল যে মানুষের মত চলা অবস্থায় শ্রীদুর্গা ও সঙ্গীয় দেব দেবীগণ বাহনাদি সহ সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। অবতারদেরও দুর্গাপূজার সময় পূজা হয়, তাঁহাদেরও একেক করিয়া চলিয়া যাইতে দেখা গেল। আর এ শরীরের দিকে চাহিয়া বলিতেছে — অমুক বাড়ীতে জাতাশৌচ জনিত সংস্পর্শ-দোষ পূজার আয়োজনাদিতে ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি। এ শরীর এক দৃষ্টিতে এই সব দেখিতেছে। মা গালে এক টোকা মারিয়া বলেন — একি লো! খাইতে বসিয়া তোর মন কোথায় যায়? এ শরীর তখন কোন জবাব দিল না। এ শরীরের শিশু বয়সেও যে এইরূপই। কখনও কখনও যে দিকে তাকাইত দৃষ্টি স্থির দেখাইত।

ঠাকুরমার এক সই ছিলেন। এই শরীর তাঁহাকে চিক্কন দিদি বলিয়া ডাকিত। তিনি নিঃসন্তান ও বাল বিধবা। এই শরীরকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাঁহার বাড়ী প্রায়ই নিয়া যাইতেন। এই শরীরকে দিয়া রান্না করাইতেন আর বলিতেন যে — তুই যা রাঁধিস্ যেন অমৃত। রান্নার হাতেখড়ি জগৎ দৃষ্টিতে তাঁহার কাছে হইয়াছিল বলিলেই চলে।

ইহাদের নিকটবর্তী এক বাড়ীতে প্রতিবৎসর দুর্গাপূজা হইত। সে বাড়ীর কর্তার মেয়ের নামও ছিল নির্মলা। তাহাদের বাড়ীতে দুর্গা পূজার তিনদিন অন্যান্য বিশেষ বিশেষ পূজার সময় থাকা খাওয়া এ শরীরের এক রকম বাঁধা ছিল। তখন দেখা যাইত একটা সুন্দর খেলা — নিজেকে নিয়াই নিজে। যে কোন দেবতার পূজাদি দেখিতে দেখিতে এই শরীরটার কেমন পরিবর্তন হইয়া যাইত — এই শরীরই দেবতা, ফুল, ভোগ উপচারাদি ও পূজক। আবার মন্ত্রাদিও। চণ্ডীপাঠেও এইরূপ বোধ হইত যে এই শরীরই সে সমুদায়। ইহাও খেয়ালে আসিত যে এ শরীর ঐ মন্ত্রাদিও অনর্গল শুনাইতে পারে। কখনো কখনো ঐ সময়ে হঠাৎ সকলের অজ্ঞাতভাবে বসা হইতে এই শরীর উঠিয়া পড়িত। কেহ লক্ষ্য করিলে আপনা আপনিই আবার সকল ভাব সঙ্কুচিত হইয়া যাইত ও শরীর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিত। এটা কিন্তু শুধু এ দেবতা পূজাই না — লক্ষ্মী-নারায়ণই বল, শিব-পার্বতীই বল, সীতা-রামই বল, রাধা-কৃষ্ণই বল, মঙ্গলচণ্ডী, ষষ্ঠী ইত্যাদি রকম রকম যত তোমাদের আছে — মুসলমানের ধারায়, খ্রীষ্টানের ধারায়, যে কোনও ধারায়ই হোক্ — ঐরূপ ভাবেরই প্রকাশ, নানা রকমারিতে, যেখানে যেরূপ তোমাদের আছে, ঐ আর কি।

এই শরীরের অনেক কাজ বয়সের হিসাবে অস্বাভাবিকও দেখাইত। একবার এ শরীরের জ্যাঠাইমা বলিলেন — ঐ উনুন ও ঘরটা লেপিয়া দে তো। তখন খুব অল্প বয়স। ন্যাংটা হইয়া লেপিয়া দিলাম। পরে তিনি সকলকে ডাকিয়া বলিলেন — দেখ এত বড় বড় দাগ পড়িয়াছে, যেন কোন বয়স্ক লোক লেপিয়া দিয়াছে। কেমন করিয়া এত ছোট হাতে এইরূপ হইল।

একবার এক দিদি দীক্ষা নিল। সে লেখা পড়া জানে না, তাহার কিছু মনেও থাকে না। মার নিকট হইতে ক্রিয়া ও মন্ত্রাদি

শিখিতে লাগিল। একদিন এ শরীরকে বলে, দেখ হাতের ক্রিয়াদি (অঙ্গন্যাস ও করন্যাস ইত্যাদি) ভুলিয়া গিয়াছি। বারে বারে তোর মাকে বিরক্ত করিতে ভাল লাগে না। তুই বল্‌ত কি করি? এ শরীর হাসিতে হাসিতে খেলায় খেলায় কি কি দেখাইল এবং বলিল — এভাবে করিয়া ফেলেন।

তোরা বলিতে পারিস্ এই ছোট্ট মেয়েটার কাছে (মার তখন ৯/১০ বৎসর বয়স প্রায়) বয়স্কা দিদি একথা জিজ্ঞাসা করেন কেন? কথাটা কি জানিস্ এই শরীরটার সঙ্গে ব্যবহার করিতে বয়সের পার্থক্যটা অনেক সময় সকলে ধরিয়া রাখিতে পারিত না, ভুলিয়া যাইত। তাহারা কিন্তু ঐ সময় ইহা বুঝিত না।

পরে মাকে সে একথা জানাইল। মা বলিলেন — এ সব কোথায় শিখল? ঠিকই ত বলিয়াছে। এ শরীরকে মা জিজ্ঞাসা করাতে বলিল — দিদির কথা শুনিয়া আপনা হইতেই এ শরীরে এ সব প্রকাশ পাইয়াছিল। মা এ শরীরের দিকে কতক্ষণ চাহিয়া ধমক দিয়া বলিলেন — তোর আপনা আপনি কেমন করিয়া আসিল? মন্ত্রাদি নিয়া তামাসা করে না, তাহা হইলে পাগল হয়। একি ছেলে খেলা? এইসব ভাল না। এই শরীরটার সহিত সব রকম বয়সের লোকই বন্ধুর মত ব্যবহার করিত।

ঠাকুরমা খুব ভাল মানুষ ছিলেন, বয়সও ঢের হইয়াছিল। তাঁহার সহিত এ শরীর হাসি খেলা করিত ত। একদিন তিনি সন্ধ্যা করিয়া ছোট আওয়াজে মুখে কি আওড়াইতে আওড়াইতে খাওয়ার ঘরে যাইতেছেন। এ শরীর তাঁহাকে বলিল — আপনি দেখি এতক্ষণ ধরিয়া কেবল এই কথাই বলিতেছেন। তিনি অবাক হইয়া বলিলেন — তুই কিরূপে জানিলি আমি কি বলিতেছি? ছেলে মানুষের মুখে এইসব বাহির হওয়া ঠিক নয়। আর একদিন তাহাকে এ শরীর কি বলিয়াছিল, তাহার যেন সর্বাঙ্গীন ভাবের পরিবর্তন হইয়া গেল। এ শরীর তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। খানিক পরে তিনি বলিয়া উঠিলেন — তোর কথা শুনিবা মাত্র আমি হুঁস হারাইয়াছিলাম।

একদিন এক দিদি শাঁখা আনিয়াছে কিন্তু কেহই তাহার হাতে উহা পরাইয়া দিতে পারে না। শাঁখা জোড়া তাহার বড় পছন্দ হইয়াছিল তাই হাতে দিতে না পারিয়া দুঃখিত হইয়া বসিয়া আছে।

এ শরীর দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল — আস দেখি দিদি, পরাইয়া দিই। সে বলিল — কেহ ত পারিল না বাকি আছিস তুই। আচ্ছা দেখ্। এ শরীর শাঁখা হাতে নিয়া অতি সহজে পরাইয়া দিল। সে বলিল — আমি ত টেরও পাইলাম না তোর ছোট ছোট হাত, আমার এত বড় হাতে কি করিয়া পরাইলি? সকলে এ শরীরের দিকে চাহিয়া রহিল।

শিশু বয়স হইতেই এ শরীরকে সকলে ভালবাসিত। মামাবাড়ী গেলে নিকটস্থ সমবয়সী মেয়েরা খেলিতে আসিত। তাহাদের জানা ছিল যে এ শরীরকে কেহ কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে খোলাখুলি সব বলিয়া দিবে, এ কারণে খেলার ভিতর যদি নিজেদের কিছু গোপন থাকিত তবে এ শরীরকে শুনাইত না এবং কোন কথা বলিতেও সাবধান হইত। অনেক সময় খেলায় এ শরীরকে রাজা বানাইয়া একধারে বসাইঁয়া রাখিত। কখনো কখনো সকলে এক জোট হইয়া এ শরীরকে হারাইবার চেষ্টা করিত কিন্তু ঘটনা চক্রে তাহারা নিজেরাই হারিয়া বোকা বনিত। অথচ এ শরীর সর্বদা তাহাদের বিবেচনার উপর সব ছাড়িয়া দিয়া আপন মনে থাকিত, হার জিতের কোনও ধারও ধারিত না।

সঙ্গিনীদের সহিত একত্র হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে কোন সময় মানুষের সঙ্গে কথা বলার মত বৃক্ষাদির সহিত এ শরীর কথা বলিত। এ অস্বাভাবিক কাণ্ড দেখিয়া তাহারা আশ্চর্য হইত। কখনো ভয় পাইত। ভয়ের কারণ ছিল এই — এ শরীর যখন গাছের সঙ্গে কথা বলিত, তখন উহারা দেখিত গাছটিও একটু নড়িতেছে, আর কিছু বুঝিতে পারিত না। শুনা গিয়াছে মহাত্মারা নাকি বৃক্ষরূপেও থাকেন। সময় সময় বিদ্রুপ করিয়া বলিত — তোর অদ্ভুত রকমের চালচলন গুলি একবার দেখা ত? তাহারা এ শরীরকে যেমন শঙ্কা করিত তেমন আবার পছন্দও করিত। কোন কাজে এ শরীরকে না পাইলে তাহাদের আনন্দ হইত না, চলিতও না।

একদিন সুশীলা দিদি (মামাতো বোন) এ শরীরের হাতে একটি তামার আংটি পরাইয়া দেয়। মা দেখিয়া বলেন — এ আংটি হাতে দিয়া মিথ্যা কথা বলিলে পাপের ক্ষয় নাই। এ শরীর বলিল — ইহার ত আর মিথ্যা কথা নাই। মা বলিলেন — ভুলেও যদি মিথ্যা বাহির হয় তবেও দোষ। এ শরীর বলিল — আচ্ছা ভুল হইবে

না। তখন শরীরের মা বলিলেন — আংটি রাখিয়া দরকার নাই। এ শরীর আংটি খুলিয়া পুকুরে ফেলিয়া দিল। সকলেই জানিত যে এ শরীর মিথ্যা কথা বলে না, তাই কোন কথা কাহারো যাচাই করিতে হইলে এ শরীর সে ঘটনায় উপস্থিত থাকিলে, ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিত এবং ইহার জবাব প্রকৃত বলিয়া ধরিত।

বাবা একবার এ শরীরকে নিয়া তাঁহার বোনের বাড়ীতে শারদীয়া পূজার সময় রওনা হইলেন। স্টেশনে গিয়া ষ্টীমার আসার দেরী থাকাতে এ শরীরকে কিছু খাওয়াইবার জন্য বাবা চেষ্টা করিতেছেন, ইতিমধ্যে এক অপরিচিত স্ত্রীলোক আসিয়া আপনার মেয়ের মত এ শরীরকে খুব যত্ন করিতে লাগিল। ষ্টীমারে উঠিবার সময় সে যেন নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত এ শরীরকে ছাড়িয়া দিল। ষ্টীমার গন্তব্য-স্থলে পৌঁছিল। সেখান হইতে পিসীর বাড়ীতে কতদূর হাঁটিয়া যাইতে হয়। অন্ধকার হইয়াছে, তাই নিকটস্থ এক বাড়ীতে রাত্রি কাটাইবার মনস্থ করিয়া বাবা সেখানে গেলেন। সে বাড়ীতে পূজা। মেয়েরা এ শরীরকে পাইয়া — আমাদের বাড়ীতে সাক্ষাৎ দুর্গাপ্রতিমা আসিয়াছে বলিতে বলিতে আনন্দ সহকারে সকলে মিলিয়া লোফালুফির মত আরম্ভ করিল। পাড়ার লোকেদের ডাকিয়া দেখাইতে লাগিল। কিভাবে যে আদর জানাইবে যেন খুঁজিয়া পায় না। এ শরীরও তাহাদের ভাবে তাহাদেরই একজন হইয়া গেল। সে রাত্রে বাবার কাছে এ শরীর রহিল না। তাহার পরদিন সকালে নূতন বস্ত্রাদিতে ভূষিত করিয়া এ শরীরকে অতিকষ্টে বিদায় দিল।

খাওয়া পরা বা অন্যান্য বিষয়ে যখন যে রকম হইত তাহাতে এ শরীরের কোন ওজর আপত্তি ছিল না। বাবা ও মা এ শরীরকে খুব স্নেহ করিতেন। বাবা কোথাও যাইতে বার বার জিজ্ঞাসা করিতেন — তোর জন্য কি আনিব? অনেক সময় এ জন্য পীড়াপীড়িও করিতেন। কখনো এ শরীর কিছু বলিত। কোনদিন একেবারে চুপ করিয়া থাকিত। পাড়াতে পরিবার জিনিস, মল, চুড়ি ইত্যাদি ফেরিওয়ালারা বিক্রয় করিতে আসিলে ছেলে মেয়েরা দৌড়াদৌড়ি করিয়া মা বাবার কাছে কত আব্দার করিত। এ শরীরের সে দিকে খেয়ালও যাইত না।

ক্ষুধা পাইয়াছে বলিয়াও কোন দিন মুখ হইতে বাহির হয় নাই। খাওয়ার সময় এ শরীরকে ডাকিয়া খাওয়াইতে হইত। সকলে

নিজের মায়ের নিকট কত কিছু চাহিয়া খায়, এ শরীরের সে রকম প্রকাশ ছিল না। সকলের দেখাদেখি এ শরীর একদিন মাকে বলে যে — খেতে দাও মা। মা বলেন — ঐখানে আছে, নিয়ে খা। এ শরীরের নিজের হাতে কিছু খাইবার স্বভাব নাই, তবুও মার আদেশমত একবার সেদিকে যায়, আবার ফিরিয়া আসে। দুই তিন বার এইরূপ করিতে দেখিয়া মা নিজে আসিয়া খাইতে দিলেন। অপবিত্র খাওয়া কিম্বা অনাচার এ শরীরের সহ্য হইত না। এ সব ঘটিলে কোন না কোন অসুখ বিসুখ হইয়া পড়িত। তাই মা খুব সাবধানে রাখিতেন।

তিন ভাইয়ের জন্ম ও মৃত্যু

আবার একদিন জিজ্ঞাসায় মা বলিতে লাগিলেন — তোদের দৃষ্টিতে এ শরীরের পরে ক্রমে ক্রমে তিনটি ভাই জন্মিয়াছিল।* প্রথম ভাইটির সর্বদা অসুখ। চিকিৎসায় কোন ফল দেখা যায় না। ইহার ভিতর ছোট মামা মাকে তাহাদের বাড়ী লইয়া যাইতে আসিলেন। ভাইটির অসুখ দেখিয়া ছোট মামা মাকে বলিলেন — তুমি ত যাইতে পারিবে না নির্মলাকে সঙ্গে দাও। ইহা শুনিয়া ভাইটি বলে — বোন্‌দি! তুই এখন যাইস্ না। আমি মরিলে যাইবি। মা বলিলেন — তোর বোন্‌দি কোথাও যাইবে না। তাহার অসুখ ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিল। এক রাত্রিতে অবস্থা খুব খারাপ হইল। সকাল বেলার দিকে মৃত্যুর লক্ষণ দেখিয়া ঘরের বাহিরে করিয়া তাহাকে উঠানে রাখিয়া দিল। এ শরীরের তখন ৭/৮ বৎসর বয়স। নিকটে দাঁড়াইয়া আছে। এইসব দেখিয়া হঠাৎ খেয়াল হইল — এখনি তো আবার ঘরেও যাইতে পারে, খাইতেও পারে, কথাও বলিতে পারে, এও তো হইতে পারে। আশ্চর্যের বিষয়, তৎমুহূর্তে আবার পরিবর্তন দেখা গেল। লক্ষণ একটু ভাল বুঝিয়া আবার ঘরে লইয়া গেল। সকলে মনে করিল পুনর্জন্ম হইল। বাঁচিয়াও উঠিতে পারে। তাহাকে ঘরে নিয়া শোয়াইয়া মা একটু বার্লির জল খাওয়াইলেন। সেও বেশ

* মায়েরা ৮ ভাইবোন ঃ—১ম—মেয়ে, ২য়—মা, ৩য়—ছেলে, ৪র্থ—ছেলে, ৫ম—ছেলে, ৬ষ্ঠ—সুরবালা, ৭ম—হেমি, ৮ম—মাখন।

একটু খাইল। একটু সময় পরে অবস্থা আবার বদলাইয়া গেল। আবার কান্নাকাটি পড়িল। অল্প সময়ের মধ্যেই পরিবর্তন দেখা গেল। এই সময় যখন তাহার শরীরটি হাতে করিয়া বাহিরে নেওয়া হইতেছিল ভাইটি এ শরীরের দিকে তাকাইয়া পরিষ্কার বলিয়া উঠিল, 'মা, মাগো মা, আমি কিন্তু মরি গো মরি মরি।' এইরূপ বলিতে বলিতে সে দেহত্যাগ করিল। ইহা দেখিয়াই সকলেই অবাক। তাহার বয়স প্রায় সাড়ে পাঁচ বৎসর হইয়াছিল। আরে! কেমন খেয়ালটা হইয়া গিয়াছিল কিনা, তৎক্ষণাৎ ইহাও হইয়া গেল, ঘরেও গেল, খাইলও, কথাও বলিল।

এই প্রসঙ্গের আলোচনায় মা বলিয়াছিলেন, — এই ভাইয়ের অসুখের বাড়াবাড়ির মধ্যে একদিন একজন আসিয়া এ শরীরের হাতে একটি খাওয়ার জিনিস দিয়া বলিল — ওকে দাও। এ শরীর তাহাকে বলিয়া দিল — না, ওর মুক্তির দিক্। যে আসিয়াছিল সে অশরীরী।

এই ঘটনার পর মা সর্বদাই কাঁদিতেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে এই শরীরও কাঁদিত। এমন কান্না জুড়িয়া দিত যে অবশেষে মা বাধ্য হইয়া চুপ করিতেন। মা বলিতেন — ইহার জন্য কাঁদিয়াও একটু হাল্কা হইবার সাধ্য নাই।

ইহার পর দ্বিতীয় ভাইটির অসুখ করিল, সে পাঁচ মাস ভুগিয়া প্রায় ৩ বৎসর বয়সে মারা গেল। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে বহুদিন ভুগিবার দরুণ ভাইটির মুখে অরুচি ধরিয়াছিল বলিয়া কিছু খাইতে চাহিত না। বাবা রাগ করিয়া একদিন তাহাকে টানিয়া একটু ছুড়িয়া ফেলেন। তাহাতে তাহার এক হাতে চোট লাগিয়াছিল।

বহুদিন পর একবার কলিকাতা যাইলে বৈদ্যবংশজাত একজন প্রফেসর তাহার একটি ৭/৮ বৎসরের ছেলে নিয়া এই শরীরের সঙ্গে দেখা করিতে আসে। সেই ছেলেটির একখানি হাত জন্ম হইতে বাঁকান ছিল। তাহাকে দেখিবা মাত্রই — দ্বিতীয় ভাইটি আবার আসিয়াছে — এই শরীর সকলকে বলিয়াছিল। পরে একদিন শরীরের বাবা ও মা উভয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু পূর্ব স্মৃতি কেহই বিশেষ করিয়া ফিরাইয়া আনিতে পারিলেন না।

তৃতীয় ভাইটিও দেড়মাস বয়সে মারা গেল। প্রথম দুইটি ভাইয়ের কোষ্ঠী দেখিয়া জ্যোতিষীরা বলিয়াছিল যে তাহাদের বহুবিধ সুলক্ষণ

রহিয়াছে তবে জীবন রক্ষা হওয়া কঠিন। দ্বিতীয়টির নাক বরাবর রাজ দণ্ডের মত একটি উচ্চস্থান কপাল হইতে মাথা পর্যন্ত ছিল। তৃতীয়টির মহাপুরুষের চিহ্নাদি ছিল।

এই শরীর পিত্রালয়ে থাকা পর্যন্ত তোদের দৃষ্টিতে এই শরীরের পূর্ব ও পরে ভাইবোন যাহারা হইয়াছিল কেহই বাঁচিয়া নাই। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ কেবল জন্ম পূরণ ও দেখা করিতেই আসিয়াছিল।

এই শরীরের বিবাহের পর একটি বোন ও একটি ভাই জন্ম গ্রহণ করে। তাহার মধ্যে কাশীতে বোনটি মারা যায়।

মা ধৈর্য, সহ্য, পরোপকারিতা, সর্বদা নিজ অবস্থায় সন্তুষ্টি, পরনিন্দায় যোগদান না করা, সাধু দেবদ্বিজে ভক্তি, নির্লোভতা, সত্যবাদিতা, শান্তভাব ইত্যাদি গুণে অতুলনীয়া। রাগ তো নাই বলিলেই চলে। এত দারিদ্র্যের মধ্যেও আনন্দের ভাবটুকু যেন লাগিয়া থাকিত।

এই সব দুর্ঘটনায় সংসারে ভীষণ শোকের ছায়া পড়িল। শোকের জ্বালায় মা কোন কোন সময় স্নান করিবার উপলক্ষ্যে শ্মশানে যাইয়া বসিয়া থাকিতেন। মা নীরবে সংসারের কাজ কর্ম করিতেন বটে কিন্তু কেমন একটা উন্মনা ভাব দেখা যাইত। অভাব অনটনও যথেষ্ট ছিল। মা এত শোক ও দৈন্যের মধ্যেও অতিথি অভ্যাগতের সেবায় ত্রুটি করিতেন না। খাইতে বসিলে যদি ভিক্ষুক উপস্থিত হইত তবে তাহাকে খাওয়াইয়া নিজে উপবাসী থাকিতেন। সর্বক্ষণ ভগবানের দিকে তাকাইয়া সকল দুঃখ তাপ অম্লান বদনে সহ্য করিতে চেষ্টা করিতেন। কাহাকেও কিছু জানাইতেন না।

ভগিনী সুরবালা

ভাই কয়টির মৃত্যুতে মাকে শোকার্ত দেখিয়া এ শরীরের একটা খেয়াল হয় যে এখন যদি একটা বোনও হইত তাহা হইলে মা অনেকটা সান্ত্বনা পাইতেন। ইহার পরই বোন সুরবালার জন্ম।

সুরবালা বয়সে এ শরীরের প্রায় ১০/১১ বৎসরের ছোট। জন্মের পর তাহার শরীর খুব হৃষ্ট পুষ্ট ছিল। রং উজ্জ্বল ফর্সা। চোখ

মুখ ও শরীরের যেন দিব্য গড়ন। যে দেখিত তাহার সৌন্দর্য ও স্বভাবে আকৃষ্ট হইত। তাহার মুখে সর্বদা হাসি লাগিয়াই থাকিত। কাঁদিবার উপক্রম হইলে তাহার মুখ কাল ও শরীর স্থির হইয়া যাইত। সকলের ভয় হইত পাছে দমবন্ধ হইয়া মারা পড়ে। এই কারণে সকলেই তাহাকে প্রফুল্ল রাখিতে চেষ্টা করিত। সামান্য কারণে হয়ত কোথাও গেল, আসিতে দেরী হইল, শীঘ্র আসিতে হইবে উহার জানা ছিল না, ছেলেমানুষ বলিয়া হয়ত একটু বেশী ধমক দিল, ব্যস্! নিঃশব্দে একটু দূরে সরিয়া গেল, হয়ত তাহার কোন আওয়াজ না পাইয়া খোঁজ করিয়া দেখা গেল, এক জায়গায় দাঁড়াইয়া কান্নার হাঁ করিয়া চক্ষু শরীর সর্বাঙ্গ স্থির। শ্বাস নাই। অতি কষ্টে দীর্ঘ সময় আদরে সান্ত্বনায় মা আসিয়া স্থির করিতেন। বলিতেন — এ আবার কোথা হইতে আসিল, কোন ঢংএর মেয়ে বাবা! যখন সে কোলের ছোট্ট শিশু, তখন তাহার এই কান্না দেখিবার জন্য অনেকে জোর করিয়া কাঁদাইত, মা আসিয়া শান্ত করিতেন। হাসিকান্না দুইটাই তাহার অদ্ভুত ছিল।

অশৌচ ঘর হইতেই তাহার উপর এ শরীরের বিশেষ নজর ছিল। তাহারও একটা বিশেষ আকর্ষণ সর্বদা এ শরীরের প্রতি ছিল। সে এ শরীরকে ছাড়া যেন থাকিতে পারিত না।

সুরবালা কিছুদিনের জন্য এ শরীরের শৈশবের খেলার সাথী ছিল। তাহার চলা ফেরায়, ডাকা খোঁজায় এমন একটি ভাব ছিল যাহা কেবল বিশেষ করিয়া এ শরীরের কাছেই প্রকাশ পাইত। তাহার প্রাণের সকল কথা সে সরল মনে এ শরীরের নিকট প্রকাশ করিয়া আনন্দ পাইত। যদিও বয়সের তফাৎ অনেক ছিল তথাপি সে এ শরীরের সঙ্গে সমবয়সী বন্ধুর মত ব্যবহার করিত। শুনা যায়, বিবাহের পরে পিত্রালয় হইতে এ শরীর চলিয়া গেলে সে নাকি অনেক দিন পর্যন্ত রাস্তায় বসিয়া 'বোন্‌দি' 'বোন্‌দি' বলিয়া ডাকিত ও কাঁদিত।

ছেলেবেলা হইতে তাহার খেলাধূলায়, মেলামেশায় সমস্ত ব্যবহারে এবং বড় হইয়া বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে সাময়িক অসুস্থ অবস্থায় — কিছু সময়ের জন্য যখন দেহ শুষ্ক, চক্ষু অন্ধ, কর্ণ বধির — সে অবস্থায়ও সে এ শরীরের চিন্তায় দিনাতিপাত করিত এবং তাহার মৃত্যুও ঠিক সেইভাবের হইয়াছিল।

বিবাহের পর প্রথম শ্বশুর বাড়ী যাইবার সময় সুরবালা নমস্কার করিতে আসিলে এ শরীরের মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল — তুমি আর বেশীদিন সংসারে থাকিও না।

এ শরীর বাজিতপুরে মৌন। একদিন হঠাৎ দেখিতেছি সে ১৮ বছরের বেশী বাঁচিবে না। তাহার তখন বয়স কত বৎসর জানিবার জন্য মায়ের নিকট ভোলানাথ পত্র দিলেন। জানা গেল সে বৎসরের অগ্রহায়ণ মাস শেষ হইলে তাহার ১৮ বৎসর পূর্ণ হইবে, তখন সে সময়ের মাত্র অল্প দিন বাকি। সুরবালার মাথার ভিতর কি এক অসুখ হইয়া চোখ খারাপ হইয়া গিয়াছিল, চোখে দেখিতে পাইত না।

ইতিমধ্যেই একজন লোক তাহার অন্ধ স্ত্রীকে নিয়া এখানে ভিক্ষা করিতে আসে। হঠাৎ এক খেয়াল হইল যে যদি এ অন্ধটিকে ৭/৮ মাসের খোরাকি ভিক্ষা দেওয়া যায়, তবে সুরবালা অন্ততঃ সে কয়দিন বাঁচিবে। তাহা হইলে ইতিমধ্যে আমি গিয়া তাহাকে দেখিতে পারিব। ঐ লোকটি প্রায় আসিত এবং চাউল ও পয়সা মিলাইয়া তাহাকে ঐ কয় মাসের খোরাকি দেওয়া হইয়াছিল।

সেই ভিক্ষাই সুরবালার মৃত্যুর নিয়ন্ত্রিত দিনের অতিরিক্ত প্রায় ৮ মাস বাঁচিয়া থাকার কারণ হইল। এই বাঁচিয়া থাকাও পরে এ শরীরের সঙ্গে দেখা হইবার কারণ হইয়াছিল। ঘটনাচক্রে এ শরীরের ঢাকা যাওয়া হয়। তখন সুরবালা অসুস্থ। এ শরীর যখন তাহার কাছে গেল, সে সময়, পূর্বে যেমন মুদ্রাদি স্ফুরিত হইত তেমন আপনা আপনি তাহাকে স্পর্শ করিয়া তাহার কানের কাছে শব্দ উচ্চারিত হইল। তাহার দীক্ষাও হয় নাই। তাহার অসুস্থ অবস্থায় চোখে দেখা ও কানে শোনা হইত না। কিন্তু ঐ শব্দ উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য তাহার দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি ফিরিয়া আসে। পরে এ শরীর চলিয়া আসিলে খুব অল্পদিনের মধ্যেই তাহার দেহান্ত হয়।

সুরবালার যখন বিশেষ অসুখ এ শরীর ঢাকায় একদিন সিদ্ধেশ্বরীতে সারারাত্রি ছিল। শেষ রাত্রিতে কেবল সুরবালার কথা খেয়ালে আসিতেছিল। হঠাৎ মুখ দিয়া বাহির হইল — তুমি এখন মুক্ত হও। তাহার পর দিন আমরা সাহবাগে ফিরিলাম। সন্ধ্যার সময় মা ও বাবা জয়দেবপুর হইতে আসিয়া বলিলেন — শেষ রাত্রে সুরবালা দেহত্যাগ করিয়াছে। মা খুব কান্নাকাটি করিতেছেন কিন্তু

এ শরীরের একই ভাব। পরে কেহ সময় মিলাইয়া দেখিলে দেখা গেল যে, যে সময় এই শরীরের ঐ রূপ খেয়াল হইয়াছিল সেই সময়ই তাহার দেহান্ত হয়।

বিবাহের তিন বৎসর পর সুরবালা মারা যায়। যদিও সে অল্প কয়েক বৎসর মাত্র সংসারে ছিল, এই অল্প সময়ে তাহার মধুর ব্যবহারে তাহার রূপ ও গুণে সে সকলকে বশীভূত করে। শিশুকাল হইতেই তাহার অসাধারণ বুদ্ধি ও প্রীতিমধুর ব্যবহার এবং পিতা-মাতার দারিদ্রের মধ্যে দুঃখ কষ্টে অপরিসীম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা তাহাকে সকলের প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল।

পিতামাতার দীক্ষা

উপর্যুপুরি এইরূপ বিপৎপাৎ দেখিয়া প্রতিবেশীরা মা ও বাবাকে বলে যে ব্রহ্মপুত্রে গিয়া অষ্টমীস্নান করিয়া আস এবং দীক্ষা গ্রহণ কর। এ শরীরকে ঠাকুরমার নিকট রাখিয়া মা আগে স্নানে চলিয়া গেলেন। বাবা পরে যাইবার সময় তাঁহার কি খেয়াল হইল, এ শরীরকে সঙ্গে নিলেন। কথা হইল যে সেখান হইতে ফিরিবার সময় এ শরীরকে বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া মা ও বাবা গুরুবাড়ী যাইবেন। কিন্তু সেবারও এ শরীর তাঁহাদের সঙ্গে রহিয়া গেল। তাঁহারা যখন যাহা বলিতেন এ শরীর চুপ করিয়া শুনিয়া যাইত। পরে আপনা আপনিই তাহাদের মত পরিবর্তন হইয়া যাহা এ শরীরের খেয়ালে আসিত তাহাই ঘটিয়া যাইত। গুরুবাড়ী যাইতে আসিতে অনেক রাস্তা হাঁটিতে হইয়াছিল বলিয়া মা বাড়ীতে আসিয়া পায়ের যন্ত্রণায় কয়েকদিন শয্যাশায়ী ছিলেন। এ শরীরের কোনরূপ উপদ্রব নাই দেখিয়া সকলে বলিল ইহার দেখি শরীরের কষ্ট বোধও নাই।

আদেশ পালন

ভাই কয়টি মারা যাওয়াতে পিতামাতার সকল মায়া মমতা এ শরীরের উপর সীমাবদ্ধ ছিল। সংসারের কোন কাজ কর্ম করিবার জন্য তাহারা বলিতেন না, বরং পাশের বাড়ীতে কেহ কখনো এ শরীরকে দিয়া তাহাদের অনেক কাজ করাইয়া নিত। বাবা মা

যখন যাহা বলিতেন এ শরীর তাহা পালন করিত। কখনো তাঁহাদের আদেশের উপর নিজের বিচারবুদ্ধি আসিত না। ছেলে বয়সে একদিন সকালে বাসনাদি ধুইবার জন্য এ শরীর পুকুরে যাইতেছে, মা বলিলেন, — পাথরের বাটিটা নিয়া যাস্ পারিস্ ত ভাঙ্গিয়া আনিস্! এ শরীর যাইতে যাইতে বৃক্ষাদির সহিত কথাবার্তা বলিতেছে এমন সময় হঠাৎ হাত হইতে পাথরের বাটিটি মাটিতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। তখন এ শরীর মনোযোগের সহিত পাথরের ভাঙ্গা টুকরাগুলি কুড়াইয়া ধুইয়া অন্যান্য বাসনাদি সহ বাড়ীতে আনিয়া ঠিক জায়গায় রাখিয়া দিল। মা দেখিয়া রাগের সহিত বলিয়া উঠিলেন — যাহা বলিয়াছিলাম তাহাই করিলি! এ শরীর বলিল — টুকরাগুলি ত সব আনিয়াছি। মা তখন মুখে কাপড় আড়াল দিয়া হাসেন। আবার এ শরীরের দিকে চাহিয়া রাগ দেখান। মা শেষে বলিলেন — ওলো বলদি! পাথরের টুক্‌রা দিয়া কি করিব? বাটিটা কি আর জোড়া লাগিবে? মেয়েটার যে কি গতি হইবে পরমেশ্বর জানেন। এ শরীরের কাজ-কর্মে এইরূপ প্রায়ই প্রকাশ পাইত। শেষে দেখা যাইত মা এ শরীরকে কোন কথা বলিতে হইলে তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিতেন, কেননা ঠিক যাহা বলিবেন তাহাই করিবে। এ শরীর সর্বদা কেমন একটা ভাবে রহিয়াছে এমন দেখাইত কিনা, কাজেই ব্যবহারিক কাজকর্মাদিতে কেবল হুকুম তামিল করিত।

আবার দেখা যাইত যদি কখনো কোন কাজে খেয়াল আসিত তাহাতে সম্পূর্ণ লক্ষ্য যাইয়া পড়িত। এমনকি শরীরের প্রতি দৃষ্টি থাকিত না। কাহাকেও সেলাই, বাঁশের বা বেতের কাজ প্রভৃতি করিতে দেখিলে ঐ কাজের নমুনায় এ শরীর কখনো কখনো অনেক জিনিষ বানাইত।

অনেক সময় নূতন ও রকমারিও করিত। তাহা দেখিয়া সকলে আশ্চর্য হইয়া বলিত বোকা মেয়েটার সবই অদ্ভুত। দশ এগার বৎসর বয়সে মা কোন কোন দিন বলিতেন — কাজ কর্ম ত কিছুই শিখিলি না, কি করিয়া যে তোর দিন চলিবে ঈশ্বর জানেন। আবার যখন দেখিতেন সেলাই বা সেইরূপ অন্য কোন কাজ কিম্বা রান্নাবান্না যখন যাহা করিতে দিতেন তাহা সুন্দর হইত, তখন আশ্বস্ত হইয়া বলিতেন — বেশ ভালই ত হইয়াছে। আমিও এইরূপ পারি না। কোন চিন্তা নাই। দরকার মত ভগবানের কৃপায় সব করিতে পারিবি।

বিদ্যালয়ে মা

খেওড়া ও মামাবাড়ী সুলতানপুর এই দুই জায়গায় মিলাইয়া মাত্র দুই চার মাস এই শরীর স্কুলে যাওয়া আসা করিয়া ছিল কিনা খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। খেওড়া স্কুল দূরে ছিল। বাড়ীতে ভাইদের অসুস্থতার দরুণ একা যাওয়া-আসা এই সব নানা কারণে সবদিন স্কুলে যাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। একবার এই শরীর মামাবাড়ী যাইয়া ৩ মাস ছিল। তখন একখানি বর্ণবোধ কিনিয়া দেয় এবং সুশীলাদিদির সহিত এ শরীর স্কুলে যাইতে আরম্ভ করে। প্রথমদিন স্কুলে যাইলে পণ্ডিত মহাশয় দুইজনকেই একবার এক পাঠ ভাল করিয়া পড়াইয়া দিলেন ও বলিলেন এখন তোমরা পড় দেখি। সুশীলাদিদি ততটা পারিল না। এই শরীরের পাঠ দেখিয়া পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন — বেশ মেয়ে। তিনি ভাবিয়াছিলেন আগে বোধহয় ভাল পড়া ছিল। স্কুলে বড় বড় মেয়েদের ছড়া শিখাইত। এ শরীরকেও তাহাদের সঙ্গে বসাইয়া দিত।

ইহার পর খেওড়া আসা হইল। সেখানে একটি নিম্ন প্রাইমারী স্কুল ছিল। সর্ব সমেত তাহাতে ১০।১২টি মেয়ে পড়িত। স্কুলের মাষ্টার মহাশয় এই শরীর সম্পর্কে দাদামহাশয় হইতেন। সেই স্কুলেই বর্ণবোধ শেষ হইল। শিশুশিক্ষাও সম্পূর্ণ পড়া হয় নাই। প্রথম শ্রেণীতে ৪টি মেয়ে ছিল। এই শরীর বয়সে সকলের ছোট হইলেও তাহাদের সঙ্গে পড়িতেছিল। ৪টি মেয়ের নূতন পুস্তক, শ্লেট ইত্যাদি, আর এ শরীরের ছেঁড়া একখানি পুস্তক, তাহাও কাহারো নিকট হইতে সংগৃহীত ও ছোট ভাঙ্গা এক টুকরা শ্লেট। তাহাতে ছোট ছোট করিয়া লিখিলেও মাত্র ৩।৪ লাইন লেখা ধরিত। এ শরীরের ত লেখাপড়ায় বড় খেয়াল যাইত না। পড়িতে বলে, তাই কখনও একটু পড়ে। এ শরীর নিয়মিত রূপে নিত্য পড়িত না। অথবা একেবারে পড়াই হইত না। মা বাপের খেয়ালে আসিলে শ্লেটের টুকরা খুঁজিয়া আনিয়া পড়িতে বসা হইত। অথচ স্কুলে দেখা যাইত যাহা জিজ্ঞাসা করিত তাহার উত্তর চোখের সামনেই আসিয়া যাইত ও ঠিক ঠিক হইত। তোমাদের যেমন এক জায়গায় একখানি ছবি দেখিলে ঐ ছবিটি চোখের উপর থাকিয়া যায়, ঐ ছবির বিষয় স্মরণ হইলে বা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তাহা বলিতে পারা যায়,

এ শরীরের কিন্তু দেখা না দেখার কোন প্রশ্নই নাই। পাঠাদির বেলায়ও ঐ রকমই। আবার ইহাও হইত যে পুস্তকের যে স্থানটির উপর এ শরীরের লক্ষ্য পড়িত সেটাই প্রশ্ন আসিত!

একদিন স্কুলে ইন্‌স্পেক্টর আসিয়াছেন। সকলে ভাল-ভাল কাপড় পরিয়া গিয়াছে আর এই শরীর ছেঁড়া বইখানি, ভাঙ্গা শ্লেটের টুকরা, নিত্য যেমন ময়লা ছেঁড়া কাপড়াদি পরিয়া, সেই সব নিয়া স্কুলে উপস্থিত হইয়াছে। ইন্‌স্পেক্টর আসিয়া সুন্দর পোষাক পরা মেয়েদের দিকে চাহিয়া পুস্তকের এক জায়গায় দেখাইয়া একে একে বলিলেন — এইটি পড়। তাহারা থামিয়া থামিয়া পড়িল। সকলের পরে এই শরীরের পালা আসিল। বলা মাত্রই এই শরীর তাড়াতাড়ি পড়িয়া গেল। ৫/৭ লাইন পড়িতেই ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, — বেশ! আর দরকার নাই। পরে তিনি লিখিতে বলিলেন। মাষ্টার মহাশয় উপস্থিত লিখিবার জন্য এই শরীরকে একটি ভাল শ্লেট আনিয়া দিলেন; ইন্‌স্পেক্টর যে পাঠটি বলিলেন তা এই শরীরের খুব জানা। তিনি এই শরীরের নির্ভুল লেখা দেখিয়া প্রশংসা করিলেন। ক্রমে ক্রমে এই শরীরের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইয়া গেল।

খেওড়া স্কুলের মাষ্টার মহাশয় মারা গেলে তাহার স্থানে এক শিক্ষয়িত্রী পড়াইতে আসিলেন। তিনিও সম্পর্কে এই শরীরের দিদিমা ছিলেন। একদিন সেখানে ইন্‌স্পেক্টার আসিবে। ছাত্রী সংখ্যা বেশী দেখাইবার জন্য তিনি এই শরীরকে স্কুলে ডাকিয়া নিলেন। সকলের সঙ্গে বসাইয়া দিলেন। এই শরীর তখন লেখাপড়ার কোন ধারই ধারে না। ইন্‌স্পেক্টার কি এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে দিদিমা বাহির হইতে আড়ালে থাকিয়া তাহার জবাব লিখিয়া দেখান। এ শরীর উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল — অ্যাঁ? কি দেখাচ্ছেন? তখন তিনি জিভ কাটিয়া সরিয়া গেলেন। যাহা হউক, ইন্‌স্পেক্টার যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহার জবাব এই শরীরের কি রকম করিয়া ঠিকমতই হইয়া গিয়াছিল। পরে ঐ দিদিমা এই শরীরকে গায় হাত দিয়া বলেন যে ১১ বৎসর বয়স হইতে চলিল এখনও তোর বুদ্ধি হইল না? ঐ রকম করিয়া কি বলিতে আছে? এই শরীর বলিল — আপনারাই না মিথ্যা কথা বলিতে নিষেধ করেন — এটা মিথ্যা হয় না?

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিবাহ

এই শরীর যখন বড় হইতে লাগিল তখনও কাহারও সহিত আপন পর ভাব ছিল না। সকলের সঙ্গেই সরলভাবে হাসিয়া খেলিয়া চলিত। খেওড়ার সম্পর্কে অনেকে দাদামহাশয় ছিলেন, তাহাদের সঙ্গে শিশুর মত আদর আবদারে এই শরীরের দিন কাটিত। একদিন এই শরীরের মা বলিলেন — বড় হইয়াছিস্, এইরকম ভাবে সকলের সঙ্গে মেলামেশা করে না। বয়স বেশী হইলে মেয়েদের পুরুষকে ছুঁইতে নাই, হাসি তামাসা করিতে নাই। কাহারো মুখের দিকে তাকাইয়া কথা বলিতে নাই। সেদিন হইতে এই শরীরের চলাফেরা আপনা আপনিই যেন পরিবর্তিত হইয়া গেল।

আবার একদিন বিশেষ আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসায় মা বলিতে লাগিলেন — ১২ বৎসর বয়স হইলে এ শরীরের বিবাহের জন্য বাবা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এ শরীরের ছোট মামা কোষ্ঠী দেখিতে জানিতেন। তিনি কোষ্ঠী দেখিতে নিয়া বারবার চাওয়া সত্বেও ফেরৎ দেন না। এই কারণে পিতামাতা ভাবিতেন কি জানি কোষ্ঠীতে বোধ হয় কিছু বিরুদ্ধ আছে। বিদ্যাকুটের কাশ্যপ গোত্র, ভট্টাচার্য বংশ প্রসিদ্ধ ও সম্মানীয়। তাহারা বিক্রমপুর ভিন্ন অন্যত্র কন্যাদান সহজে করিতেন না। অন্য দেশ হইতে ভাল ভাল সম্বন্ধ আসিল, কিন্তু সে সব ফিরাইয়া দিলেন। অবশেষে বাবা পাত্রের সন্ধানে নিজেই বিক্রমপুর গেলেন।

এদিকে ঠাকুরমার খুব অসুখ হইল। একদিন হঠাৎ দৌগাছির শ্রীযুক্ত সীতানাথ কুশারী মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া বাবা বাড়ীতে আসিলেন। তিনি ভোলানাথের বড় ভগ্নীপতি। সম্বন্ধাদি একরকম পাকাপাকি করিয়াই কুশারী মহাশয় এই শরীরকে ডাকিয়া কথাবার্তা বলিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। পরে একটি শুভদিন দেখিয়া আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ইহার পর ঠাকুরমা দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার শ্রাদ্ধাদি হইয়া গেলে মাঘ মাসে বিবাহের দিন ধার্য হইল। বিবাহের প্রস্তাবে গ্রামের